4.6
৪৩৫

অহিংস বিপ্লব

Code NO 4·6

অহিংস বিপ্লব

[আচার্য কৃপালনীর Non-Violent Revolution-এর
বাংলায় অনুবাদ]

৪৩৯

আচার্য জে. বি. কৃপালনী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

গান্ধী শতাব্দী সংস্করণ

দাম : ২·০০

18.1.2011
14432

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল), কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস, ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

স্থচীপত্র

অহিংস বিপ্লব

আধুনিক সভ্যতার সমস্যা

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

মানব-সভ্যতা বর্তমানে এক বিচিত্র ও জটিল রূপ নিয়েছে। এর এক দিকে যেমন স্পষ্টতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি, প্রীতি ও দানশীলতা, অপর দিকে তেমনি সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, অবিচার, নৃশংসতা ও অবজ্ঞা। যেসব ব্যাপার নিয়ে পূর্বতন লোকেরা মোটেই মাথা ঘামাতেন না, এখন তা আমাদের বেশ ভাবিয়ে তোলে। দুর্ভাগারা আগে কোন সহানুভূতি ও সহায়তার আশা রাখত না, কিন্তু এখন তারা তা পেতে পারে। মানুষ এখন কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম এবং অন্ধ, মূক ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছে। মোট কথা, আমরা এখন প্রকৃতি ও মানুষের দেওয়া দুঃখের যতখানি সম্ভব লাঘব করতে চেষ্টা পাই। সমর-সংগ্রামে যে আমাদের বিশেষ স্পৃহা আছে তা নয়, তবে একে একেবারে বিদায় দিতেও পারছি নে; তাই মারামারি কাটাকাটিও করতে হচ্ছে, আবার 'রেডক্রস' প্রতিষ্ঠান ক'রে আহতদের

সেবাশুশ্রূষাও করতে হচ্ছে। শিশু ও বিধবাদের অভাব-অসুবিধা মোচনের বহু উপায় আমরা এখন অবলম্বন করেছি; বৃদ্ধ, অথর্ব, পীড়িত ও বেকার লোককেও আমরা যথাসম্ভব সাহায্য দিই; সমাজের নিকট তাদের দাবিও আমরা মেনে নিয়েছি। এক কথায় সারা সভ্য সমাজ এখন যে কোন জায়গায় বিপদ-আপদের প্রতি সজাগ ও সতর্ক। জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষই আজ আমাদের পড়শী। দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং ভূমিকম্প হ'লে আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে সাহায্য আসছে মানুষের দুঃখমোচনের জন্য। আজ মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে দেখা দিয়েছে অধিকতর সততা, শালীনতা ও আন্তরিকতা। বিগত যুগের গুণ্ডামি ও মাতলামি আর স্বার্থ-দ্বন্দ্বও অনেকখানি এসেছে ক'মে। গৃহদাহ, চুরি, হত্যা, এসব কাণ্ড এখন ক্বচিৎ কখনও ঘ'টে থাকে বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। ক্রীতদাসত্ব ঐতিহাসিক প্রাচীনতা লাভ করেছে, এও সত্য। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এখন প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সে কথা অস্বীকার করা চলে না। মানুষের জ্ঞান দিন দিন যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনি গভীরতাও লাভ করেছে। পাঠাগার, গ্রন্থাগার,

মিউজিয়াম, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতির কল্যাণে শিক্ষা ও জ্ঞান ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক-গণও যথেষ্ট আনুকূল্য পাচ্ছেন। মানব-সমাজের খেলা-ধূলা বা আমোদ-প্রমোদও অনেকখানি নিয়মিত ও সংযত হয়েছে। এইসব ব্যাপার থেকে এ অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, মানব-সমাজ এখন অনেকখানি শুদ্ধ সুস্থ হয়েছে। মানুষের জীবনকে আজ আশা ও আনন্দে স্ফূর্ত ও দীপ্ততর ক'রে তোলবার চেষ্টা চলেছে চারিদিকেই। শিশু-মৃত্যুর হার এখন বেশ ক'মে গিয়েছে। রোগযন্ত্রণা উপশমের কত উপায়ই না এখন হয়েছে! শুধু মানুষই নয়, পশুরাও চিকিৎসা ও নিরাময় ব্যবস্থা হতে বাদ পড়েনি। পশু-পাখিদের প্রতি এখন মানুষের কত সহৃদয়তা ও সমবেদনা! পশুদের প্রতি নির্দয় আচরণ নিবারণ করবার জন্য গ'ড়ে উঠেছে কত প্রতিষ্ঠান। এইসব দেখে মনে হয়, সভ্য সমাজে জীবন কত সহজ সরল ও সুন্দর হয়েছে; নিতান্ত গোঁড়া, রুচিবাগীশ ও দোষদর্শী লোক ছাড়া এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না।

ব্যষ্টি-জীবন হতে সমষ্টি-জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, মানব-সমাজের বিশেষ কিছু উন্নতি তো হয়ই

নি, বরং অনেক দিকে তা পিছিয়ে গেছে। সমষ্টি-জীবনের বর্বর নীতি ছাড়া অপর কোন নীতি আছে বলে মনে হয় না। জড়বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দূরত্ব এখন ঘুচে গিয়েছে বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না সত্য, কিন্তু জাতিতে জাতিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে আরও উৎকট ও ভয়ানক হয়ে উঠেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এদের সম্পর্ক ও ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে অহমিকা, সংশয় আর অবিশ্বাস। আজ ব্যষ্টি-জীবন যদিও বা আমাদের সহানুভূতি পেয়েছে, সমষ্টি-জীবনে কিন্তু সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সুখশান্তির কোন ঠাঁই নেই। এদিক থেকে মানুষের জীবনের কোন দাম আছে ব'লে মনে হয় না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নেই কোন সদ্‌ভাব। নির্লজ্জ নীচতা ও নগ্ন শঠতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে করেছে তিক্ত, মিথ্যা আর প্রতারণা একে করেছে কলুষিত। চক্রান্ত, স্বার্থপরতা, মিথ্যা দোষপ্রচার, কূটনীতি, প্রলোভন, জালিয়াতি, উপদ্রব, লুণ্ঠন, হত্যা আন্তর্দেশিক সম্পর্কের রীতি ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের জীবনকে আজ কোন এক অজানা উদ্দেশ্যের উপায় ব'লে মনে করা হয়। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক দেশ অপর দেশকে চাইছে শোষণ করতে;

অপরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে না তাকিয়ে এক দল অপর দলের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে চাইছে সম্ভবমত সুখসুবিধা। দম্ভ, স্পর্ধা, শ্রেণী ও বর্ণ-বৈষম্য আন্তঃ-সামাজিক সম্পর্ককে করেছে লাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত। যুদ্ধ সংখ্যায় যদি বা এখন ক'মে থাকে তো নৃশংসতা ও বীভৎসতায় বেড়েছে অনেক; কোন কিছুই এর কাছে বিচার বা শ্রদ্ধার বিষয় নয়। ধর্মযাজক, ভক্ত, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কৃষক, বণিক, সকলেই এর সেবা করতে বাধ্য। তুচ্ছ ও কল্পিত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য একাগ্র সাধনালব্ধ ও সূক্ষ্মতম বুদ্ধিপ্রসূত মারণাস্ত্রের প্রয়োগ এক অতি সহজ ব্যাপার। কামান, ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ এ সবই বৈধ অস্ত্র। শিশু, নারী, নিরপেক্ষ জন, বে-সামরিক অসামরিক অধিবাসী,—সকলেই বোমা কিংবা বিষবাষ্পের কল্যাণে হয় নিশ্চিহ্ন, আর নয় আজীবন পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। কোন করুণা কিংবা প্রীতির স্থান নেই এই দলীয় জীবনে, সততা আর সৌজন্যের বালাইও এতে নেই। মানব-সভ্যতার প্রগতিতে গভীর বিশ্বাসী লোকও বোধ হয় এইসব ঘটনা অস্বীকার করতে লজ্জা বোধ করবেন।

তা হ'লেই এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, কেন এমনটি হ'ল? কী কারণে মানব-জীবন এক দিকে এত করুণা ও সহানুভূতিপূর্ণ আবার অপর দিকে তেমনি নির্মম, এক দিকে যেমন সুন্দর অন্য দিকে তেমনি জঘন্য? এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে এর সমাধানের উপায়।

দ্বৈত নীতি

ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের আচরণের মধ্যে ব্যবধানের কারণ এই যে, মানব-সমাজ এখন দুটি অবস্থায় দুটি নীতির আদর্শ গ্রহণ করেছে। একটিতে যা ভাল ব'লে বিবেচিত হয়, অপরটিতে তাই মন্দ। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে শালীনতা ও শিষ্টাচার পালন করা সৌজন্য ও ভদ্রতা ব'লে মনে ক'রে থাকি, কিন্তু দলগত জীবনে তার সার্থকতা ও প্রয়োজন বোধ করি নে। এই জন্যই একটি রাষ্ট্রের নিকট অপর একটি রাষ্ট্রদূতের আচরণে নানান ছলাকলা ও অপকৌশলই নীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, তা সে যথার্থ অথবা কল্পিত হোক, রক্ষা ও সিদ্ধ করবার জন্যে তিনি যে কোন উপায় ও উপকরণ অবলম্বন করতে সংকোচ বোধ করেন না। একজন মিথ্যাচারী

প্রতারকের স্থান সম্ভ্রান্ত সমাজে না থাকতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সংসদে সেই ব্যক্তিই বিশেষ সম্মান ও সমাদরভাজন বিবেচিত হয়ে থাকেন। প্রতিবেশীর বিষয়-সম্পদ না ব'লে অধিকার করলে তাকে আমরা বলি চুরি, কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধন-সম্পদ অচিন্ত্যনীয় অত্যাচার ও জুলুম ক'রে অধিকার করাকে মার্জিত ভাষায় বলা হয়ে থাকে শৌর্য ও গৌরব। দারিদ্র্য ও ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করতে বাধ্য হ'লে পেতে হয় কারাবাসের সৌভাগ্য, আর আপন দেশের বিলাস-ভোগের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে অপর দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করলে তাকে আপন হৃদয়ে স্থান দিতে পেরে ইতিহাস ধন্য ও কৃতার্থ হয়। ব্যক্তিগত হত্যার জন্যে মানুষকে ঝুলতে হয় ফাঁসিকাঠে, কিন্তু স্বদেশের স্বার্থ-পরমার্থ বৃদ্ধির জন্য নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ লোককে অবিচারে বধ করলে পুরস্কার ও সম্মান দিয়ে তাকে উৎসাহিত করা কর্তব্য মনে করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে আচরণ হবে শান্ত ও ভদ্র—এটা ন্যূনতম প্রয়োজন, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে দম্ভ, কর্কশতা, প্রতিহিংসা, লালসা, আঘাত-আক্রমণ আচরণকে দেয় একটা মহিমা কিংবা মর্যাদা। ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থত্যাগকে মানুষের অধিকার

কি কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয় ; কিন্তু একটি জাতি অপর জাতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে যদি স্বার্থত্যাগ করে, তা হ'লে সে ব্যাপারটি হয় বিদ্রূপের বিষয় ; নিছক বোকামি ছাড়া তাকে অন্য নাম দেওয়া মূর্খতা। কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী ব্যক্তির স্থলে দণ্ড দেয়, তবে তাকে পশু নামে অভিহিত করা হয় ; কিন্তু কোন মিলিটারী কি পুলিস অফিসার যদি কোন জাতি বা জনসমাজকে দু-একটি লোকের প্রকৃত বা কল্পিত অপরাধের জন্য নিপীড়িত করে, তা হ'লে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক ও নায়ক হিসাবে তার যশ বেড়ে যায়। এদের সম্মানে ভূষিত করবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহের অন্ত থাকে না, এরাই আবার পুণ্যাত্মা ও ধর্মভীরু ব'লে প্রচারিত ও পরিচিত হয়। তাই মনে হয়, সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে নীতিবোধের কোন সম্পর্ক নেই, দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

মানব-সমাজ এই দ্বৈত নীতি ও উপায় অবলম্বন ক'রে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ককে উপেক্ষা করেছে। সমষ্টি ব্যতিরেকে ব্যষ্টির কোন মূল্য নেই। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যবহারে যদি বর্বরতা দেখা দেয়, তবে তার

ব্যক্তিজীবনের গতি ও নীতি বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। মানব-সমাজকে তখনই যথার্থ সভ্য বলা যেতে পারবে, যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টি—এই উভয়ের নীতি শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তির নীতিশীলতা ও সমষ্টির দুর্নীতিপরতার মধ্যে আপোস হওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ উন্নতির জন্য দুইএর নীতি ও আদর্শের মধ্যে থাকা চাই সাম্য, ব্যক্তির উন্নতি অথচ সমাজের অবনতি এই সাম্যকে দেয় নষ্ট ক'রে।

ঐতিহাসিক উদাহরণ

ব্যষ্টি ও সমষ্টির নীতি ও আদর্শের মধ্যে বৈষম্যের ফলে মানব-সমাজ যে পিছু হটেছে—ইতিহাসে তার নজীর আছে। ভারতের ইতিহাসে এর অভাব নেই। মোটের উপর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে বেশ পরিচ্ছন্ন বলা যেতে পারে। তারা নিত্য স্নান করে এবং অনেকেই প্রত্যহ পরিধেয় পালটায়। তাদের ঘরবাড়ী, আসবাবপত্রও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু তবুও জাতিহিসাবে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নই কেন? এর একমাত্র কারণ এই যে, ব্যক্তিগতভাবে আমরা পরিচ্ছন্ন হ'লেও জাতিগতভাবে

আমাদের পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। আমাদের ধারণা স্ব স্ব বাসগৃহ,পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন রাখলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল ; সাধারণের ব্যাপারে অর্থাৎ গ্রাম, শহর, পথঘাট প্রভৃতিতে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নেই। এই সব ক্ষেত্রে সকলেই উদাসীন, যেন এতে কারও কোন দরকার নেই। আমরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হই যে, ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করলেই নোংরামির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আমাদের এ খেয়াল থাকে না যে, বাড়ীর বাইরে যে ময়লা ফেলে দেওয়া হয়, তা থেকে মশা, মাছি, পোকামাকড় জ'ন্মে নানান রোগ ছড়ায় এবং তাতে নিজেদেরও অব্যাহতি থাকে না। এ তো প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা কি ভদ্রলোকের স্নান করা জল উপরতলা থেকে পড়ে পথচারীদের পরিধান নষ্ট ক'রে দেয়। এ থেকে এই মনে হয় না কি যে, আমাদের কাছে সমগ্র সমাজের সুখ বা কল্যাণের কোন দাম নেই, ব্যক্তিই আমাদের কাছে সর্বস্ব ? সামাজিক কোন কর্তব্যবোধকে আমরা আমল দিই না। এর ফল যে শুধু সমষ্টির পক্ষেই মারাত্মক হয়েছে তা নয়, ব্যক্তির পক্ষেও।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ জ্ঞানকে শুদ্ধ ও পবিত্র ক'রে রাখতে চেয়েছিলেন। অনধিকারীদের তাঁরা তা দিতে চান নি। মাত্র দুটি উচ্চবর্ণেরই তাতে অধিকার ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে তার ফল কি দাঁড়াল ? আমাদের বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন ও বহু ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আজ আমরা বোধ হয় সবচেয়ে অশিক্ষিত জাতি। অধিকাংশ হিন্দুই তো বেদ বলতে অজ্ঞান, কিন্তু অশিক্ষিতের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, ক'জন শিক্ষিত লোক, পাঠ করা দূরে থাক, বেদ চোখে দেখেছেন অন্তত ? জনসাধারণকে যে অজ্ঞান তিমিরে ফেলে রাখা হয়েছিল, আজ তা সকলকেই গ্রাস করতে বসেছে।

অস্পৃশ্য জাতির সৃষ্টি ক'রে আমরা নিজেদের পবিত্র রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ কি উচ্চ কি নিম্নবর্ণের একজন ভারতীয় শুধু বিদেশে নয়, স্বদেশেও অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র। ইংরেজই আজ যেমন যথার্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ; ভারতবাসীকে আজ ভারতেই অন্ত্যজের মত বাস করতে হচ্ছে। কালের পরিহাস বলা যাবে কি একে ? এই নীতি-নিয়মিত ধরণীতে ব্যষ্টিগত কিংবা সমষ্টিগত কোন উপেক্ষা বা ঘৃণা যদি প্রকৃতির নিয়মকে ভাঙতে চায় তো

প্রকৃতি তার পরিশোধ নেবেই নেবে—দুদিন আগে, নয় দুদিন পরে।

তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরস্পর ওতপ্রোত। এই দুইয়ের একটি যদি এগিয়ে যায়, অথচ অপরটি থাকে পিছিয়ে, তা হ'লে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না কোন ; আর তাতে ক্ষতি হয় উভয়েরই। সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল লোকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে, মানব-সমাজ যদি সমষ্টি-সম্পর্কের সমস্যা ও প্রশ্নগুলির সমাধান না করে এবং সমষ্টি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও নীতি-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত না করে, তা হ'লে সভ্যতার সকল উন্নতির ফল প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিয়ে মানুষকে আবার সেই আদিম পশুস্তরে ফিরে যেতে হবে। দুটি কি তিনটি আন্তর্জাতিক সমরই মানব-সমাজকে হিংস্র বর্বরতায় নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে ব'লে মনে হয়।

অতএব একথাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, সভ্যতাকে রক্ষা করতে হ'লে শুধু ব্যক্তিগত সভ্যতা থাকলেই চলবে না ; যে সমষ্টিগত জীবনের পাশবিকতা আমাদের বহু যুগের শ্রেয় ও প্রেয়ের সাধনা এবং ধ্যানধারণাকে বিনাশ করতে বসেছে, সেই সমষ্টি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে নীতি-

বোধের দ্বারা। কিন্তু এর কি কোন উপায় আছে? থাকলে, কি সে উপায়? দেখা যেতে পারে ব্যক্তিজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস এ বিষয়ে কোন সংকেত দিতে পারে কি না!

অহিংসার পথে

মানুষ কেমন ক'রে সভ্যতার পথে এগিয়ে এল? কি উপায় এর জন্যে সে অবলম্বন করেছিল? সব জাতির একই সময়ে না হ'লেও, এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ পশুর মতই বন্য জীবন যাপন করত। তখন পরস্পর বিরোধ তো লেগেই থাকত। পশুশক্তিই তখন ছিল একমাত্র নীতি। কিন্তু এ অবস্থা তো স্থায়ী হতে পারল না। আর যদি এমন অবস্থা বহুকাল টিকত—মানুষ তা হ'লে এতদিনে লুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ বিরোধ ও বিদ্বেষের নীতির স্থলে অন্য নীতির উদ্ভাবন করল ব'লেই সে টিকে গেল। কি সে সংহতি-শক্তি, যা নরনারীকে পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতি গঠন করবার প্রেরণা দিলে? ঘুরিয়ে বললে, একে 'অহিংসা' বলা হয়, আর সোজা ভাবে বললে 'প্রীতি'; এই প্রীতিই হচ্ছে শান্তি ও সহযোগিতার

উৎস। মানুষের সৃষ্টির সব কিছুই ধীরে ধীরে হিংসার পথ ছেড়ে অহিংসার পথে যাত্রা করেছে। এর দৃষ্টান্ত কিছু দেওয়া যেতে পারে।

পরিবার

পরিবারই মানুষের গড়া প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। ধীরে ধীরে অত্যাচার অপসারিত হয়ে পারিবারিক সম্পর্কে এল প্রীতি ও শান্তি। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, পরিবারের সকলের উপরেই ছিল গৃহকর্তার অখণ্ড অধিকার। স্ত্রী ও সন্তান ছিল স্বামী ও পিতার সম্পত্তির মত। তাদের দেহ ও প্রাণের উপর ছিল তার সর্বময় কর্তৃত্ব। আদিমকালে মানুষ তার এই অধিকারের ব্যবহার করেছে, কখনও কখনও তাদের বিক্রয় ক'রে। তার পরের যুগে সে শুধু তাদের অবাধ্যতার জন্য দৈহিক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। এই পারিবারিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রেরও ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রই এই অধিকারের অসহনীয় অবস্থায় হস্তক্ষেপ ক'রে থাকে। শিশুদের অধিকারও এখন রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানটির যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটেছে বিচিত্র রকমের। অপহরণ ও বলপ্রয়োগ এক সময়ে ছিল এর ব্যবহারসম্মত রীতি; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্ত্রীর ওপর কোন অত্যাচার করা হ'ত না। এর মধ্যে যে একটি বিস্ময়কর মাধুর্য ছিল, তা আধুনিক বিবাহের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল ব'লে মনে হয় না। কিন্তু আরও উন্নত অবস্থায় পৌঁছতে তখনও বাকা রইল। নরনারীর এই সুন্দর সম্পর্কের উপর পিতামাতার অত্যাচার, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কুসংস্কার এখন পর্যন্ত রইল চেপে। একদিন নরনারীর বিবাহ ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে ছিল খলতা ও শঠতা, কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে এসেছে অনেকখানি সততা ও আন্তরিকতা।

পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে অধিকার-সাম্য এখন আর তেমন বিতর্কের বিষয় নয়; অনেকাংশে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক বৈষম্য ও অসুবিধাও দূর করা হয়েছে। বাস্তবিক যে যুগে বহুদিন প্রবাসের পর স্বামী বাড়ী ফিরে প্রথামত স্ত্রীকে না প্রহার করলে স্ত্রী মনে করত তাদের প্রণয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে ফাটল—সে যুগ

থেকে মানুষ আজ কতখানি এগিয়ে এসেছে। আধুনিক কোন রমণী কি ভাবতেও পারেন যে, ঐ রকম একটা ব্যাপার এককালে ছিল প্রণয়-প্রকাশের রীতি ?

শিশুপালন

প্রাচীনেরা এ কথা ভাবতেই পারতেন না যে, কিল চড় না দিয়েও শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া যায়। শিশুকে শাসন না করলেই সে গোল্লায় যাবে—এই ছিল তখনকার শিক্ষানীতি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই নীতি যে একেবারে বিদায় নিয়েছে তা নয়। এটুকু আজ না স্বীকার ক'রেই পারা যাচ্ছে না যে, শুধু চাবুক আর বেত দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দেওয়াও শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়। শিশুরা এখন তাদের স্বাধিকার ফিরে পাচ্ছে। তাদের জীবনগুলিকে ক'রে তোলা হচ্ছে হাস্য-দীপ্ত ; পরম যত্নে ও সহানুভূতি দিয়ে এখন তারা লালিত হয়ে থাকে।

এমন এক সময় ছিল এবং এখনও হয়তো বহু পরিবারে আছে, যখন শিশুর প্রতিটি কৌতূহল নিবৃত্ত করা হ'ত চপেটাঘাতে। মা-বাপ যদি কিছুটা ভদ্র হতেন তো নানান মিথ্যা ও ছল-চাতুরি দিয়ে শিশুর কৌতূহল মেটানো হত।

পরম সুখের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক ভাল বিদ্যালয় ও শিক্ষিত পরিবারে ঐসব রীতি উঠে গিয়েছে।

সভ্য সমাজের শিশুর মনোভাবই আজ গিয়েছে বদলে। আগেকার শিশুরা যদি-বা প্রহারের ভয়ে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করত, আজকালকার শিশুরা তা মোটেই করতে চায় না। বিশেষ প্রীতি ও যত্নে লালন না করলে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হতে চায় না।

ধর্ম

অসি আর আগুন নিয়ে হয়েছে এর আরম্ভ। মানুষ ও পশু-বধ ছিল এর অঙ্গ। সেকালে কত লোককে যে জোর-জবরদস্তি ক'রে দীক্ষিত বা ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এর জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহই কি বড় কম হয়েছে? এক নিতান্ত অসভ্য সমাজ ছাড়া আজ এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, গায়ের জোরে কিংবা ঠকিয়ে মানুষের মন আর বিশ্বাসকে বদলে দেওয়া যায় না। এখন অবশ্য এর ঠাঁই অধিকার করেছে আরও সূক্ষ্ম উপায়, যেমন—উৎকোচ, নানাবিধ সামাজিক সেবানুষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমে এ নীতিও নিন্দিত হতে চলেছে। ধর্ম এখন ব্যক্তির

18.1.2011
145432

নিগূঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয় ব'লে স্বীকৃত ; সত্যসন্ধা ভক্তহৃদয়ের যে ধর্মগ্রহণ তাই শুধু সত্য ও সংযত। এ ছাড়া যে কোন নীতিকেই প্রকৃত ধার্মিকেরা অত্যাচার ব'লে মনে করেন।

বাণিজ্য

লুণ্ঠন, অপহরণ ও দস্যুতা দিয়ে এর আরম্ভ। এই কয়েক শতাব্দী আগে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি বণিকসংঘ পাঠিয়ে নানা দেশে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। রাণী এলিজাবেথের সময় আমেরিকা হতে আনীত মূল্যবান পণ্য-সামগ্রীপূর্ণ স্পেনীয় জাহাজ লুঠ করা ইংলণ্ডে ভাল ব্যবসা ব'লে মনে করা হ'ত। স্পেনীয়রাও অবশ্য অনুরূপ উপায়ে সেসব সম্ভার আহরণ করত। নিগ্রোদের অপহরণ ক'রে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা তো ইংরেজদের পক্ষে একটা বেশ লাভের ব্যবসা ছিল, এবং এ বিষয়ে তারা তাদের একাধিকার রাখতে কত কাণ্ডই না করেছে! কিন্তু এখন তা উঠে গিয়েছে। অবিশ্যি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অত্যাচার ও শঠতা যে সূক্ষ্মরূপে এখনও কিছু কিছু আছে, তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু উন্নতি যে

অনেকখানি হয়েছে, তা মানতে হয়। বণিকের কথাকেই আজ দলিলের মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। প্রবঞ্চনার অবকাশ থাকলেও সাধারণত এখন বাণিজ্যে পারস্পরিক সুবিধা ও উপকারের দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। নমুনা দিয়ে মাল বিক্রি, বাঁধা দর—এসব ব্যবসায় দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এ ব্যাপারে অসাধুতা ও প্রতারণা দূর করবার বিশেষ চেষ্টাও চলেছে। তথাপি কম দামে বাজারে পণ্য ছেড়ে প্রতিযোগীকে হটিয়ে বাজার অধিকার করা, শ্রমিক-শোষণ, উৎপাদিত সম্পদের অসম বণ্টন প্রভৃতি অন্যায় এখনও চলছে। কিন্তু আশার কথা এই যে, মানুষের বিবেক বুদ্ধি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়বার জন্যেও তৈরি হচ্ছে।

শাসনতন্ত্র

পশুশক্তিই ছিল গভর্নমেণ্টের উৎপত্তির মূল; এই শক্তিই ছিল এর অস্ত্র ও উপায়। রাষ্ট্রজীবনের গোড়ার দিকে দলপতি বা রাজার আদেশই ছিল আইন; কোন নীতি বা আদর্শের বালাই এর মধ্যে ছিল না। একটি ব্যক্তির খেয়াল-খুশিই ছিল এই আইনের প্রাণ; কোন

অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি কিংবা দয়ার স্থান এতে ছিল না ; নির্যাতন আর অত্যাচারই ছিল এর লক্ষ্য। কিন্তু সুখের বিষয়, এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল ; একটি ব্যক্তির স্থান দখল করলেন কতিপয় জন। ব্যক্তির বদলে শাসন করতে লাগল একটি দল। এতে এই সুবিধা হ'ল যে শাসকদের সকলের অনুমোদিত একটি নীতি বা ধারা অনুসৃত হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে নব নব বিধিবিধান রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে চলল। তা হ'লে কি হয়, এর অনেক কিছুই শাসক সম্প্রদায়ের লোকেরাই অমান্য করতে লাগলেন। তখনও নিরপেক্ষতা আইনের আদর্শরূপে গণ্য হয়নি। এর পরে এল গণতন্ত্র। জনসাধারণের সকলের মতই হ'ল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়নের উপাদান। এর জন্যে ব্যবস্থা-পরিষদ হ'ল গঠিত ; যে কোন বিধিকেই রচিত হতে হবে এখানে। রাষ্ট্রশক্তি ও কর্মব্যবস্থার মধ্যে এল বিভাগ। কিন্তু এখানেই হ'ল না এর শেষ। বস্তুত, দেখা গেল যে, শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হ'ল শুধুমাত্র নামে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল জন কয়েকের আয়ত্তে। দীনদরিদ্রের স্বাধীন মত ব্যক্ত করার মত অবস্থা ও শাসনতন্ত্রে তাদের প্রভাববিস্তার তখনও হয়নি। তাই বর্তমানে চেষ্টা চলেছে রাজনৈতিক

মুক্তির স্থলে সামাজিক মুক্তি প্রতিষ্ঠার। মোট কথা, পশুবলকে এখন সব সময়ে কাজে না লাগানো হ'লেও সব গভর্নমেণ্টই যে এর উপর প্রতিষ্ঠিত—এ মতবাদ এখনও খণ্ডিত হয়নি; তবে এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ ও দমন করবার জন্য এই শক্তিকে প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগানো হয় যখন, তখন এর ব্যবহার তেমন একটা হয় না।

অপরাধবিধি

প্রাচীন কালে সকল অপরাধই ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার। নিতান্ত গুরুতর অপরাধ না হ'লে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করত না। নিজে বা কোন আত্মীয়স্বজন ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে ক্ষতিকারী ব্যক্তি বা তার আত্মীয়স্বজনদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যুক্তিযুক্ত ব'লে বিবেচিত হ'ত। বংশানুক্রমে সন্তানগণ সম্পত্তির মত বিবাদ-বিসংবাদেরও অধিকারী হ'ত। একটি পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবারের পুরুষানুক্রমে কলহ চলেছে এমনও অনেক ছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র এইসব ব্যাপার নিষ্পত্তি করবার ক্ষমতা গ্রহণ করল। এর ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণতা

অনেকখানি ক'মে গেল। এরও পরের যুগে প্রত্যেক অপরাধের আর্থিক দণ্ড নির্ধারণের ব্যবস্থা হ'ল; বিবদমান ব্যক্তিরা অর্থমূল্য দিয়ে ও নিয়ে বিবাদের মীমাংসা ক'রে নিত। এইভাবে দেখা যায়, অপরাধ ব্যক্তিগত স্তর হ'তে সমষ্টিগত স্তরে উন্নীত হয়েছিল অতি ধীরে ধীরে। বর্তমানে অধিকাংশ অপরাধই রাষ্ট্রের বিচারের বিষয় ব'লে গণ্য হয়, কেননা, শেষ পর্যন্ত তা রাষ্ট্রের পক্ষেই হানিকর। তাই বাদী-বিবাদীদের সকলকেই এখন আদালতের আশ্রয় নিতে হয় ও তার বিচার মেনে নিতে হয়।

শাস্তিবিধি

পুরাকালে এর রীতি ছিল নৃশংসতা ও বীভৎসতাপূর্ণ। ক্রীতদাসত্ব, অঙ্গচ্ছেদ, শূলবেধ, যন্ত্রণাদায়ক মরণ প্রভৃতি ছিল তখনকার দণ্ডব্যবস্থা। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও যেসব অপরাধকে এখন আমরা সামান্য ব'লে মনে ক'রে থাকি, ইংলণ্ডে তার দণ্ড ছিল মৃত্যু। আধুনিক যুগে প্রত্যেক সভ্যদেশেই ঐসব দণ্ডবিধির পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর। কোন কোন দেশ তো মৃত্যুদণ্ড একেবারেই উঠিয়ে দিয়েছে। আর যেখানেও বা আছে, সেখানে একে যতদূর সম্ভব

যন্ত্রণাহীন করা হয়, আগেকার মত প্রকাশ্যেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। দণ্ডবিধির নীতি ও রীতি গিয়েছে বদলে। প্রতিহিংসাকে এখন আর বড় একটা কেউ নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার উপায় ব'লে মনে করে না। ধীরে ধীরে এখন এই মত প্রসারলাভ করছে যে, অপরাধপ্রবৃত্তির মূলে পারিবারিক প্রতিকূল অবস্থা ও হীন পরিবেশ না থাকলে তা মানসিক ব্যাধিবিশেষ; শারীরিক শাস্তি দিয়ে তাকে শোধরানো যাবে না, মানসিক চিকিৎসা দ্বারাই তাকে সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তুলতে হবে। তাই কারাগারগুলি আজ বিকৃত মানব-চরিত্রের শোধন ও সংস্কারের আয়তন মাত্র। সেখানে আততায়ীদের শেখানো হয় নানারকম ব্যবহারিক বৃত্তি; তাদের অন্যায় আচরণ-প্রবৃত্তিকে দূর ক'রে, দেহমনকে বলিষ্ঠ ক'রে পাঠানো হয় সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীন নাগরিক জীবন যাপন করবার উদ্দেশ্যে।

সাধারণ আইন

সুদূর অতীতে উত্তমর্ণ আপন ইচ্ছামত উপায়ে অধমর্ণের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় ক'রে নিতে পারত, এতে রাষ্ট্র মোটেই মাথা ঘামাত না। পাওনাদার

দেনদারকে কিছুকাল বা চিরকালের জন্য ক্রীতদাস ক'রে রাখতে পারত ; ইচ্ছা করলে তাকে অঙ্গহীন ক'রে রাখার, চাই কি প্রাণ পর্যন্ত নেওয়ার অধিকার ও স্বাধীনতাও তার ছিল। অতএব রাষ্ট্র ধীরে ধীরে এ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রহণ করল। দেনদারের প্রাণ, অঙ্গ বা স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার পাওনাদারের চ'লে গেল। এর পর এই দাঁড়াল যে, দেনদারের বংশধরগণ তার ঋণের জন্য পাওনাদারের কাছে দায়ী হবে না, তবে যে সম্পত্তি তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাবে, তার উপরে শুধু ঋণ বর্তাতে পারবে। বর্তমান কালে পাওনাদার দেনদারের সম্পত্তিতে স্বেচ্ছায় হাত দিতে পারে না, এ বিষয়ে রাষ্ট্রের আদালতের মীমাংসাই তাকে মেনে নিতে হয়।

চুক্তি ব্যাপারে, ভৃত্য ও কর্মচারীদের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে ও এমনি কত কি সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারেও ঐ নীতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। মানব-জীবনের সকল কার্যক্ষেত্রেই অহিংসা, প্রীতি ও সত্যের কল্যাণেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে। এই মূলনীতিগুলি না থাকলে সমাজ ব'লে কোন জিনিস গড়ে ওঠা সহজ হ'ত না, হয়তো বা পৃথিবীতে মানুষ ব'লে কোন কিছু থাকত না। তা

হলেই বলতে পারা যায়, সমষ্টিগত মানুষকেও যদি সভ্য ব'লে গণিত হতে হয়, তবে তাকেও ক্রমশঃ অনুরূপভাবে এগোতে হবে। এই সমষ্টিজীবনেও সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিদ্বেষ দূর ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বাস, সত্য, প্রীতি ও অহিংসাকে। তা না হ'লে কি ব্যষ্টি কি সমষ্টি-জীবন দুইই বিপন্ন হবেই হবে।

ব্যষ্টি-মানুষকে সভ্য ও সামাজিক ক'রে তোলবার জন্যে মানুষকে দুটি উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। এক হচ্ছে, জ্ঞান ও সংস্কারের দ্বারা তার অন্তরকে তৈরি করা; দুই, অসামাজিক ও অন্যায় কাজের বিপত্তি ও বিঘ্নকর পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করা। একটা হ'ল মন ও ভাবের দিক; অপরটা হ'ল কাজ ও বাইরের দিক। অবতার, ঋষি ও মহাপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষায় ও আচার-ব্যবহারের প্রভাবে ব্যক্তি-চিত্ত উন্নত হয়েছিল। রাজন্যবর্গ, শাসক, রাজনীতিবিদ্ ও ব্যবহারবিদ্‌গণ এঁদের শিক্ষার অনেক কিছুকেই চালাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যখনই এর ব্যত্যয় হয়েছে অর্থাৎ মহাজনদের সাধনা ও ধ্যানধারণালব্ধ সত্য ও নীতিগুলিকে ব্যবহার্য ক'রে তোলা হয়নি, তখনই ঘটেছে ঐসব সম্পদের বিলোপ।

সমষ্টি-জীবনের সংস্কার করতে হ'লেও ঐ দুই উপায় অবলম্বন করতে হবে, ভাব কর্ম্মের মধ্যে আনতে হবে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য। এর অভাব হ'লে কোনটার প্রকাশ পূর্ণ হবে না। এরই জন্যে টিকল না জাতি-সঙ্ঘ বা 'লীগ্ অব্ নেশন্‌স্'। এর ব্যর্থতার কারণ এই সমষ্টিগত জীবনে মানুষ এখনও ন্যায়, সত্য ও শিবের নীতিকে আয়ত্ত করতে বা মেনে নিতে পারেনি ; অন্তর হয়নি এখনও শুদ্ধ ও সত্যধৃত। বাইরের জোরে শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। সঙ্ঘের সব সদস্যই বস্তুত যুদ্ধ ও কূটনীতিতে ছিলেন আস্থাবান, বচনে ও বক্তৃতায় তাঁরা যাই প্রচার করুন না কেন। সমষ্টি-মন দূরের কথা, ব্যষ্টি-মনই এখনও ঐ নীতি গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু প্রচার হয়েছে তা ব্যক্তি বা সমাজকে নূতন নীতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ থাকলেও প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র বানাতে থাকলে লীগের অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হয় কি ক'রে ? আভ্যন্তরিক দুর্বলতা ও অশুদ্ধতার জন্যেই ওটি ভেঙ্গে পড়ল। পরাজিত জাতিগুলির ক্লান্তি ও অসামর্থ্যের জন্যই জাতি-সঙ্ঘটি এতকাল কোনরকমে টিকে ছিল তার জীর্ণ-

দীর্ণ দেহখানি নিয়ে। এই ভীতি ক্লান্তি কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের ধ্বংস-প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ; তাই এরা আবার আর এক মহাপ্রলয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পথ-সঙ্কেত

এই অবস্থায় বিকারের মরীচিকা-লুব্ধ পথভ্রান্ত এই ধরণীতে গান্ধীজি আনলেন সত্য ও অহিংসার বাণী। ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও কালোপযোগী কর্মব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যেই হ'ল তাঁর আগমন। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁর মধ্যে ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে কর্মকুশলতা ওতপ্রোত। পূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের সহিত সত্য ও অহিংসাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পালন ও প্রকাশ করা, এই কূটনীতি, হিংসা ও যুদ্ধের যুগে বিশেষত, অনেকের কাছে অসম্ভব ও অসঙ্গত বলেই মনে হয়। তাই বিশেষ ক'রে তাঁর বিপক্ষগণের মনে সন্দেহ জাগে গান্ধীজি সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ কিনা। এই অত্যাচার ও অন্যায়কীর্ণ জগতে তাঁর চিন্তাধারাকে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলেই ধারণা হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট রূপে এদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে

এদের ব্যবহারিকতাকে প্রমাণ করেছেন বলেই তাঁর আইডিয়াগুলিকে অতীন্দ্রিয় স্বপ্ন ও ভাববিলাসের অকর্মণ্য কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া সহজ হয় না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ভক্ত শিষ্যদের এই নব মন্ত্রে উদ্‌বোধিত ক'রে ও বিরোধীদের প্রাণেও শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত ক'রে সফলকাম হবেন কি না—সে কথায় রায় দিতে পারবে একমাত্র ভবিষ্যৎ। কিন্তু এ কথাও নিশ্চিত যে অচিন্ত্যনীয় রকমের সাফল্য তিনি পেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ ও কাইরোতে অহিংস সংগ্রাম করা ছাড়া তিনি তিনটি সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও সুব্যবস্থিত সাম্রাজ্যের অন্যায় ও অবৈধ শক্তির বিরুদ্ধে একটি নিপীড়িত জাতি জানিয়েছে তার প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। আর কোন যুদ্ধই তেমন অহিংস ও বিদ্বেষহীন হয়নি। প্রাণনাশ এতে অতি সামান্যই হয়েছে বলতে হবে। পিতৃহীন শিশু ও বিধবার ক্রন্দনও এতে বিশেষ কিছু শোনা যায় নি। বে-সামরিক লোক ও সম্পত্তি এতে সম্পূর্ণ নিরাপদই ছিল। বিপক্ষীয়দের জীবন ও সম্পত্তিও নিরুপদ্রব ও নিরাপদই ছিল। শোক-তাপও মানুষ এতে প্রায় কিছুই পায়নি

বলা চলে। সাধারণ একটা বিপ্লবের আগুন হিংসা, ঘৃণা ও নির্দয়তাকে দিত ছড়িয়ে, বিজেতা ও বিজিত—ক্ষতি হ'ত এই উভয়েরই। কিন্তু এই অহিংস সমরে উভয় পক্ষেরই ক্ষতির হার অতি অকিঞ্চিৎকর, যদিও নৈতিক শক্তির দিক থেকে অত্যাচারীর ক্ষতি হয়েছে অপরিমেয়। গান্ধীজির এই তিনটি সংগ্রামের পর ভারতের স্বরাজ আজ নিশ্চিত ব'লে মনে হয়েছে। ভারতের অন্তরাত্মা বিদেশী শোষকের দানবীয় মায়া ও ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। তার দর্প হয়েছে চূর্ণ, মানসিক সাম্য হয়েছে নষ্ট, আর মেরুদণ্ড হয়েছে ভগ্ন। এখনও স্বরাজ আমাদের করগত হয়নি, সে কথা সত্য। কিন্তু, তাই ব'লে সংগ্রাম বৃথা হয়েছে, একথা বলবে কে? জাতীয় জীবনের আশা-অভিলাষে অনভ্যস্ত, জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে প্রাচীরবদ্ধ ও বিভক্ত, আর সবার ওপর, বহু শতাব্দীর পরাধীনতা ও দাসত্বে পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই ভারতীয় জাতির পক্ষে পনের বছরের এই অল্পকাল মধ্যে মুক্তি বা স্বরাজ লাভ করা কি বাহুবল ও হিংসা দ্বারাও সম্ভব হত? অন্যান্য দেশে কী ভীষণ সংগ্রামই না হয়েছে! কত প্রাণনাশ আর কত দুর্ভোগ ও দুঃখ কতকাল ধরে মানুষকে

পেতে হয়েছে। একমাত্র ভারতই এই অনর্থ ও ক্ষতি হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে। গান্ধীজি এই মহাঅনর্থকারী যুদ্ধের বিকল্পে যোঝবার জন্য আবিষ্কার করলেন একটি মানস সামর্থ্যের। একে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিপাটি করে তিনি কাজে লাগালেন ; কিছু প্রত্যক্ষ ফলও এর পাওয়া গেল। হতে পারে, জাতীয় সমস্যার সমাধান এখনও এর দ্বারা হয়নি। কিন্তু এই হচ্ছে অগ্রবর্তী আন্দোলন ; ভাবীকালের সে লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথনির্দেশও রয়েছে এরই মধ্যে ; এই হিসাবে এর ফলাফল নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় মোটেই নয়। সারা পৃথিবীর মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি ও চিন্তা আজ এ দিকে ফিরেছে।

উপস্থিত পরিস্থিতিতে গান্ধীজির নীতি ও কার্যপ্রণালী বিস্তার লাভ করতে পারে নি ; ভারত স্বাধীন হ'লে কি অভিনব উপায়ে তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সম্পর্ককে তাঁর নীতি দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন তা তিনি নিজেও অনুমান করতে পারেন কিনা সন্দেহ। এখন তাঁর শক্তি একটি উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার দিকে নিযুক্ত। এই সংগ্রামে তিনি দেশকে দিয়েছেন একটি নূতন ভাব, একটি নূতন

অস্ত্র ও নীতি। তাঁর ভাবকে তিনি কার্যে রূপায়িত করেছেন।

প্রকৃত সত্যাগ্রহীর কোনও অশুভ কামনা বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কিন্তু তাই ব'লে, তিনি যে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর আস্থাবান তা নয়। তবে এই শক্তিকে সুসংবদ্ধ ক'রে বাইরের জগতের কাজে লাগিয়ে তিনি উপকার ও প্রয়োজন সাধন করেন। যে-কোন আধ্যাত্মিক শক্তিই বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এলে তার পবিত্রতা কিছুটা নষ্ট হয়ই; এবং সে হিসেবে কিছুটা মালিন্য সত্যাগ্রহতেও লাগে। কিন্তু তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়; এটুকু আধ্যাত্মিক ক্ষতির দাবি প্রকৃতির সহজ অধিকার। শুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনার কোন স্থূল দেহ নেই; স্বতঃস্ফূর্ত সে, তার প্রকাশের জন্যে দরকার করে না কোন জড় বস্তুর। কিন্তু এই অমিশ্র শুদ্ধতা তো আর পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব নয়! ঠিক এই কারণেই, গান্ধীজির প্রবর্তিত নীতি ও পথ সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সব সময়ে ব্যবহৃত হতে না পেরে থাকে কিংবা কখন-সখন যদি বা একটু-আধটু মানসিক ও বাহ্যিক উত্তেজনা প্রকাশ পেয়ে থাকে তো তার জন্যে গান্ধীজি বা তাঁর সত্য ও অহিংসার বাণীকে কটাক্ষপাত করা সৌজন্য

নয়। এই পৃথিবীতে যিনি সাধারণের চেয়ে যতখানি বেশী ভাল করতে পারেন, তাঁর ততখানি শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করাই শিষ্টাচার। পূর্ণ সত্য ও সুন্দরের অপূর্ণ এবং সাময়িক প্রকাশ দেখেই মানুষের তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় দেখা যায় না।

অহিংসা-নীতির দুই রূপ : প্রাচীন ও নবীন

প্রাচীন কালে ধর্মগুরুগণ যুগ-যুগ ধ'রে প্রীতি ও অহিংসা-নীতিকে যেভাবে ব্যবহার করতেন গান্ধীজি তেমন ভাবে করেন নি ; তাঁর পথ কিছু স্বতন্ত্র। তখন তা ছিল প্রধানত মানসিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত। ব্যবহারিক প্রয়োগ যে এর ছিল না এমন নয় ; তবে বস্তুজগতের প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলির সমাধানে এর ব্যবহার তেমন একটা দেখা যায়নি। শুধু আভ্যন্তরিক শক্তির ওপরই ছিল এর নির্ভরতা। প্রত্যক্ষ ফল এর কোন কিছু না পাওয়া গেলে লোকে নিরাশ হত না, তারা ভাবত অন্তত সুদূর ভবিষ্যতে এর ফল পাওয়া যাবেই। মাটিরই পৃথিবী আর এই মায়ার সংসার ছিল না এ রাজ্যের অন্তর্ভূত। আপন শক্তিতে এ ছিল অধিষ্ঠিত ; কোন ঐহিক কি পারত্রিক ফল-

লাভের লোভ এর ছিল না। সেইজন্য, প্রাচীন যুগে অহিংসা-নীতি ব্যবহারিক রূপ নেবার বিশেষ কোন প্রয়াস করেনি। অতীব শোচনীয় ব্যাপার এই যে, সাধু-মহাত্মাগণ এই নীতির আন্তরিক শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকতেন, একে বাহ্যিক প্রয়াসে সংহতি ও সহযোগিতা দ্বারা জীবিত ও পুষ্ট করা বিধেয় ব'লে মনে করতেন না। কিন্তু এইসব মহাপুরুষগণ সংখ্যায় ছিলেন অতি অল্প। যদি বা তাঁদের কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাতন্ত্র থাকত তো তা পার্থিব ব্যাপারের জন্য নয়, অপ্রত্যক্ষ, অনির্দিষ্ট কোন নির্বাণ কি মোক্ষের জন্য ; নিতান্তই তা পারলৌকিক। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এ রকম প্রতিষ্ঠান ছিল। লৌকিক ব্যাপারে তাঁরা বড়ই নিরাসক্ত ও উদাসীন থাকতেন ; তাঁরা ভাবতেন, ঈশ্বর বা প্রকৃতির যন্ত্রগুলি যথারীতি তাদের কাজ ক'রে যাবে। সাধারণ লোকেরা কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ বিষয়ে তেমন নিশ্চিত না থাকায় অনেকখানি স্বনির্ভর হ'য়ে তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, সৎলোকদের পক্ষে আশ্বাস ও আত্মিক আনন্দের অভাব না ঘটলেও

পৃথিবীর যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় জিনিস তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে শুধু অসৎলোকেরা।

প্রাচীন যুগের প্রেমধর্মের রীতি ছিল অপ্রতিরোধের নীতি। মন্দকে প্রতিরোধ কোরো না ঃ এক মাইল পথ হাঁটতে বাধ্য করা হ'লে দু মাইল হাঁট, এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দাও, কারণ মন্দের প্রতিরোধ করলে মন্দের বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী, আর কিসের জন্যই বা প্রতিবাদ ? অন্তরের শক্তি এবং সৌন্দর্যে যে মহীয়ান্ ও সমৃদ্ধ, বাইরের মালিন্য আর দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করবে কি করে ? এই ত প্রকৃতির অভিনয়। কত মনোমোহন ফুল ফুটছে নিত্যকাল ; নিজেকে শোভান্বিত করার কোন চঞ্চল আয়াস তো তাদের নেই, অথচ সৌন্দর্যও তাদের উথলে পড়েছে ; কোন রাজকীয় ভূষণ-প্রসাধনের সাধ্য হয় এদের মাধুর্যের কাছে দাঁড়াতে ? তাই বহু আঘাত খেয়েও এরা থাকে সুন্দর। তেমনি যে-মানুষ নিজেকে চিনেছে বা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিরোধের দ্বারা তাকে নিজস্বতা রক্ষা করতে হয় না, কেননা, আঘাতে তা নষ্ট হয়ে যাবার নয়। এই অপ্রতিরোধ বা সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মে নানা গল্প

আছে। একটি হিন্দু উপকথায় আছে যে, একটি চোর এক সন্ন্যাসীর কুটীরে প্রবেশ করে, কিন্তু পাছে কিছু না পেয়ে তাকে শূন্য মনে ফিরে যেতে হয় এই ভেবে সন্ন্যাসী তখন তাঁর দেহস্থ কম্বলটি ছুঁড়ে দেন যাতে সে সেটি নিয়ে যেতে পারে। এই রকম ধরনের গল্পে নীতিজ্ঞান একটা থাকবেই। এখানে তা হচ্ছে এই যে, চোরটিই পরে সাধু বনে গেল। কিন্তু এর সঙ্গে এ রকম মতও তখন ছিল যে অহিংসাও আবার অতিমাত্রায় ভাল নয়; কারণ হিংসার বোঝাটা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাঁধেই চাপানো হয়। তাই অনেক সাধু বিরক্তির ভান ক'রে কিছু কর্কশ কথা বলতেন এইজন্য যে অহিংসা ও প্রেমের মর্ম না বুঝে যেন অনেকে বিপথে না যায়।

বলা বাহুল্য এরূপ নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ও প্রকাশ না থাকায়, এ কেবল সন্ন্যাসীদের উপযুক্ত হতে পারে, গৃহীর নয়। এ কারণেই রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপারে এ নীতি গৃহীত হ'ল না ব'লে বিস্ময় লাগে না। কেননা, জনসাধারণ পূর্ণত্যাগ আর আত্ম-বিসর্জনের নীতি নিয়ে সংসারে বেশীদিন চলতে পারে না। অকারণ নির্যাতন-ভোগ সঞ্চিত হ'য়ে কোন দূর ভাবীকালে দুর্বৃত্ত ও দুষ্টদের

ওপর কোন্ অদৃশ্য প্রত্যাঘাত রূপে ফিরে এসে তাদের অভিভূত করবে, অথবা, আত্মত্যাগ পুঞ্জিত হ'য়ে অত্যাচারী বর্বরের হৃদয় করুণার্দ্র ক'রে তাদের অপ্রতিভ ও লজ্জিত ক'রে তুলবে—এই আশা চিন্তায় তো আর সংসারী মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। সত্য ও অহিংসার নীতিকে যদি মানুষের বাস্তব জগতের উপকারে লাগাতে হয়, তো একটা পরিমিত কালের মধ্যে তাকে কিছু ফল দেখাতেই হবে, নইলে তা অব্যবহার্য ও অকেজো হ'য়ে পড়েই থাকবে। সে কারণেই প্রয়োজন, এই নীতিকে বাস্তবে প্রতিফলিত করা। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের বুদ্ধি ও কর্ম-প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে এর দ্বারা, এবং এর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য গড়ে তুলতে হবে এর অনুগত যন্ত্র ও তন্ত্র। সত্যাগ্রহ-অহিংসা ও সত্য-নীতিকে ঐ রূপ দেবে; সত্যাগ্রহ-মন্ত্রের রচয়িতা ও উপাসক তা সপ্রমাণ করেছেন। সত্য ও অহিংসার এই নীতিকে ব্যবহারিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করায় এর গভীরতা কিছু কমবে তা ঠিক, কিন্তু এর জন্যে যে বিস্তর লাভ এর হবে—সে বিচারে ক্ষতির চেয়ে লাভই এতে বেশি হবে।

আগেকার যুগে যা সম্ভব ছিল না এখন তা সম্ভব হয়েছে। তুনিয়া এখন এমন একটা অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে যে হরতাল ও অসহযোগ ক'রে, সত্যাগ্রহ দ্বারা, এর জটিল কর্মযন্ত্রকে অচল ক'রে দিতে পারে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসার, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে স্থান-ব্যবধানের অপসারণ, সংবাদপত্র ও প্রচারের দৌলতে জনমতের প্রভাব সারা তুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্পোৎপাদনের দ্বন্দ্বকলহে তা বেশ সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। শ্রমিকেরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হ'লে অল্প সময়ের মধ্যেই কারখানা বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। আর, একটা শিল্প বন্ধ হ'য়ে গেলেই অল্পবিস্তর অন্যান্য উৎপাদনও থেমে যেতে থাকে। ব্যাপক হরতাল ও কর্মবিরতি ঘটলে সুব্যবস্থিত প্রতাপশালী গভর্নমেণ্টকেও শ্রমিকদের সঙ্গে একটা রফা করতে বাধ্য হতে হয়; কারণ, শ্রমিকদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে সব কলই বিফল হ'য়ে যাবে। আধুনিক যুগে অন্তত এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, অনাচার-অত্যাচার যদি টিকিয়ে রাখতেই হয় তো শুধু যে নির্যাতিতদের মৌন সম্মতি থাকলেই চলবে তা নয়, যে-কোন উপায়ে হোক

তাদের সচেতন সহযোগিতা চাই-ই চাই। দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষকে বাঁধা হয় যে শেকলে, তা তো তাদেরই তৈরি। একবার যদি তারা অসহযোগ করে, তা হ'লে শিল্প, বাণিজ্য ও সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরাট অট্টালিকা একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। এই চেতনাই শ্রমিক আন্দোলনকে করেছে সফল। সর্বহারা দীনদরিদ্রের প্রাণে আশা জাগিয়েছে এই চেতনা। জনসাধারণ এখন এটুকু বুঝতে পেরেছে যে, তারাই সকল শক্তির উৎস, সকল শিল্প, বাণিজ্য ও গভর্নমেণ্টের ভিত্তি ; অতএব, অত্যাচারের প্রতিকার করতে হ'লে চাই নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে অসহযোগ। স্বার্থবাদী লোক ছাড়া একথা আজ আর কেউ বলবে না যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হরতাল বা অসহযোগের কোন দাম নেই। এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, শিল্প ব্যাপারে হরতাল প্রভৃতি না হ'লে শ্রমিকদের বহু দাবি আজও অবধি মেনে নেওয়া হ'ত কিনা সন্দেহ। যে কারণে অসহযোগ সম্ভব ও ফলদায়ী হ'তে পারে ঠিক সেই কারণে ব্যাপক সত্যাগ্রহও সম্ভব। এতেও ঠিক ঐ একই রকম কর্মপদ্ধতি ও উপকরণ হ'লেই চলবে। এদের মধ্যে তফাত কাজের উপায় উপকরণে

নয় ; সে বিষয়ে যথেষ্ট সমতা এদের মধ্যে আছে ; তফাত হচ্ছে এদের আভ্যন্তরিক প্রেরণায়।

স্বার্থ-সংঘাত, শ্রেণীসংঘর্ষের বোধেই হয় অসহযোগ বা ধর্মঘট। শ্রেণীদ্বন্দ্বই হ'ল এর ভিত। এক শ্রেণীর যাতে ক্ষতি, অপরের তাতে লাভ। তা হ'লেই দেখা যায়, বিরোধ বিদ্বেষ থাকলেও ধর্মঘট নীতিমত বাহুবল প্রয়োগ করতে বিরত থাকে। যাঁরাই ধর্মঘট আন্দোলনকে সফল করেছেন তাঁরাই এ কথা সম্যক্ জানেন। তাঁরা জানেন যে, সাফল্যের জন্য একান্ত ভাবে এই নীতি অবলম্বন অপরিহার্য ; কারণ, বিপক্ষের বাহুবল এত শক্তিশালী ও সুব্যবস্থিত যে নিপীড়ন ও তার ফলে নৈরাশ্যের গ্রাস হ'তে বাঁচিয়েই ধর্মঘটিদের নৈতিক বল ঠিক রাখা সম্ভব হয়। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটিদের বাহুবল আশ্রয় করতে বাধ্য ক'রে ধর্মঘটকে বিচ্ছিন্ন ও ব্যর্থ ক'রে দিতে পেরেছেন। তাই শিল্প-ধর্মঘটে দেহবলের অপ্রয়োগের নীতিই হ'ল ঠিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কৌশল ব'লে যেটা গ্রহণ করা হয়, সত্যাগ্রহে সেটাই মূল ও আদর্শ নীতি ব'লে স্বীকৃত হয়। বাহ্যিক স্বার্থ-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহী জীবনের অন্তর্নিহিত

ঐক্যকে উপলব্ধি করেন। দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য ধর্মঘটি যে নীতি আশ্রয় ক'রে থাকেন, সত্যাগ্রহী তা করেন আত্মশক্তির প্রেরণায়। তিনি জানেন যে, বাহুবল ও অস্ত্রবলের চেয়ে চিত্তবলই শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'তে সহায়তা করে, এবং এইজন্যই তিনি তাঁর আস্থা এতে স্থাপন করেন। কিন্তু, তাই ব'লে তিনি বাহ্যিক উপায়কে উপেক্ষা করেন না, যদিও তাঁর সে উপায় ধ্বংসমূলক নয়। সহযোগিতা ও সংহতিই হ'ল তাঁর অস্ত্র। অত্যাচারী যে পশুবলের চেয়ে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার শক্তিতেই বেশি শক্তিমান সত্যাগ্রহী সে কথা জানেন। এবং ঠিক এ কারণেই তিনি অহিংসা-প্রতীতি-প্রসূত আত্মিক-শক্তিলব্ধ কর্মপ্রতিভা দিয়ে অত্যাচারীর কর্মশক্তিকে যোঝেন। তাঁর থাকে কল্যাণ-নীতিতে গভীর বিশ্বাস; সে বিশ্বাস তাঁকে তাঁর সংকল্প, লক্ষ্য ও উপায় বিষয়ে করে সতর্ক। তাঁর অহিংসা দুর্বলতা বা প্রয়োজনের তাগিদে নয়, স্বেচ্ছায় ও নৈতিক শক্তির প্রেরণায়।

বিভিন্ন ধরনের লোকের নানা স্তরের বুদ্ধি, জ্ঞান ও মানসিক বিকাশের উপাদান নিয়ে কাজ করতে হয় সত্যাগ্রহীকে। সে কারণে, শুদ্ধ আন্তরিক শক্তি যেখানে

মেলা দুষ্কর সেখানে বাহ্যিক আনুগত্য ও অনুবর্তন পেয়েই তাঁকে তুষ্ট থাকতে হয়। ধর্মসংস্কারকের মতই তাঁকে তা গ্রহণ ক'রতে হয় এই বিশ্বাসে যে, এই বহিরঙ্গীয় আনুগত্যই অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে পরে অন্তরঙ্গীয় পরিবর্তন ঘটাবে। এই বাহ্যিক আচরণের কুফল তিনি জানেন, কিন্তু তবু সে দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হয়। সাধারণ লোকের ব্যাপারে এ জিনিস মেনে নিলেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেলায় তা তিনি না মানতেও পারেন। সত্যাগ্রহ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ও 'অসহযোগ' শব্দের দ্বারা। কিন্তু এ শব্দগুলি দিয়ে ওর আসল অর্থ প্রকাশ করা যায় না। সত্যাগ্রহ নিষ্ক্রিয়ও নয়, শূন্যাত্মকও নয়; কর্ম, নিয়ন্ত্রণ, উদ্যম ও প্রতিরোধের মূর্ত নীতি এ। এর দৈহিক প্রতিরোধের অংশটুকুকে নিষ্ক্রিয় বলা যেতে পারে কিন্তু এর নৈতিক প্রতিরোধের অংশখানিকে অতিশয় সক্রিয় ও সচেতন না ব'লে পারা যায় না। অত্যাচার ও অন্যায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোন সুবিধা-সুযোগ পেতে চায় না এই শক্তি, এইজন্য এই ব্রতগ্রহীর জীবনের শুদ্ধীকরণ দরকার। এ এক রকম সংস্কার বা উপনয়ন।

এর জন্যে প্রয়োজন কিছু নিয়ম ও সংযম পালন করা। কখন কখন সাধারণ-বিচারে-নির্দোষ অনেক ব্যাপারেই শাসন-নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যেমন, বিদেশী দ্রব্য-ব্যবহার, সরকারী উপাধি-গ্রহণ, সরকারী আইন-আদালতের আশ্রয়-গ্রহণ প্রভৃতি। কখন কখন আবার অস্পৃশ্যতা, মাদক দ্রব্য-ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষতিকারক জিনিসের ওপর এ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই বিধি ও নিষেধ-মুখী নিয়ন্ত্রণ সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই নিয়ন্ত্রণের বিশেষ একটা লক্ষ্য সর্বত্রই বিদ্যমান। সকল ধর্ম ও বৃহত্তর সংগ্রামেই নিয়ন্ত্রণ-নীতির ব্যবহার না থেকেই পারেনি। বলশেভিক নীতিতে কোন অধ্যাত্মবাদ আছে এ কথা কেউ-ই বলবেন না, কিন্তু সেখানেও সৈন্য ও নাগরিকদের ওপর যে নিয়ম বন্ধন আছে তার সংখ্যা খুব কম নয়।

সত্য ও অহিংসা-নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ

পুরাকালের ধর্মসংস্কারকদের অপ্রতিরোধ-নীতি সমষ্টি-গত জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ এক অন্য রূপ নেয়। বোঝা দরকার যে, সত্যাগ্রহ প্রাচীন অর্থে অপ্রতিরোধ-নীতির

ব্যবহার করে না। দৈহিক বল প্রয়োগ ব্যাপারেই শুধু এর অপ্রতিরোধ, তা-ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই প্রবল প্রতিরোধই এর নীতি। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গান্ধীজি এমন কথা বলবেন না যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দেড়-শ বছর ধ'রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা ভারতকে কোটি-কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে ব'লে তাদের অন্তর-শুদ্ধির জন্য ভারত থেকে ইংলণ্ডে আরও অর্থ পাঠান দরকার। বরং তিনি এই কথাই বলবেন যে, আমাদের সহযোগিতার জন্যেই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ভারতকে শোষণ করা। অতএব যাতে অর্থ দেশ থেকে বেরিয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে স্বদেশী বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন ক'রে। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীকে তিনি বলবেন, ভারতে যেসব দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব সেসব জিনিস বিদেশ থেকে আনিয়ে ব্যবসা করা অতীব অন্যায় ; এমন ক'রে যে অর্থ উপার্জন হয় তা অতিশয় নিন্দনীয় ও পরিহর্তব্য, বিদেশী পণ্যকে আনুকূল্য দিয়ে নিজের বিপদ ও তার দেশবাসীর দারিদ্র্য ডেকে আনতে গান্ধীজি নিশ্চয়ই নিষেধ করবেন। এখানে তাঁর উপদেশ হবে এই যে, একজন ভারতীয়ের প্রথম কর্তব্য

হবে ভারতীয়কে সাহায্য করা। একটি মাতাল এক ভাঁড় তাড়ি চাইলে সত্যাগ্রহী তাকে দু ভাঁড় দেবেন না। তাঁর কাজ হবে সুরাপানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণগুলো দূর করা এবং ক্ষমতা থাকলে এর জন্যে আইন করা। গান্ধীজি এমন কথা বলবেন না যে, রাজার যা সুযোগ-সুবিধা তাই থাক, তাঁর কথা হবে এই যে মানুষের সেবা করার গৌরব ও সৌভাগ্য রাজার হওয়া উচিত। তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ; সে কর্তব্য-সাধনে যতটুকু অর্থসম্পদ লাগে তা তাঁর প্রাপ্য। গান্ধীজি এ ব্যবস্থায় এ কথাও জানতে চাইবেন যে রাজার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব জনমতের দ্বারা সমর্থিত কি না। এই জনাধিনায়কের জাতি, ধর্ম, বর্ণ বিষয়ে গান্ধীজির কোন জিজ্ঞাস্যই থাকবে না। কোন ব্যক্তি-বিশেষের সহিত সত্যাগ্রহীর কোন বিবাদ থাকতে পারে না; তাঁর যা বিবাদ তা বিশেষ কতকগুলি ধারা বা ব্যবস্থাবিধানের সঙ্গে। অসঙ্গত ব্যবস্থা যতদিন মানুষ চালাতে থাকবে ততদিন তার বিরোধিতা করতেই হবে। সত্যাগ্রহীর বিশ্বাস যে, অন্যায় ব্যবস্থার কর্তারা ঐ ব্যবস্থা-শাসিত লোকদের মতই অবমানিত। ঠিক এই কারণেই ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কোন বিদ্বেষ তাঁর নেই।

প্রাচীন যুগের অপ্রতিরোধ-নীতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মতবাদ হিসেবে ভালই ছিল ; কিন্তু নিজের ও ঈশ্বরের প্রতি ছাড়া কোন কর্তব্য এ ব্যবস্থার নীতি ছিল ব'লে মনে হয় না। সামাজিক কর্তব্য নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি এ নীতির ছিল না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব এই উভয়ই সত্যাগ্রহের নীতি। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনীতিক অথবা রাজনীতিক কোন অন্যায় কর্তৃত্ব বা স্পর্ধিত শাসন না স্বীকার ক'রে ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করাই ছিল প্রাচীন অপ্রতিরোধ নীতির স্বরূপ। সত্যাগ্রহ এর ওপর সমষ্টিগত অধিকার রক্ষা ব্যাপারেও উদ্‌যুক্ত। শুধু ব্যক্তি-অধিকার রক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠাপনই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু সমষ্টিগত প্রতিবিধান ব্যবস্থা দ্বারা অন্যায় ব্যবস্থার উচ্ছেদ করাও এর লক্ষ্য। কিন্তু এ ব্যাপারে হীন ও জঘন্য ব্যবস্থার সহযোগিতা ও সমর্থন না করার অবিসংবাদিত অধিকার-প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য, দৈহিক শক্তি-ব্যবহার নয়। এই হিসেবে, সুনিয়ন্ত্রিত সত্যাগ্রহের দ্বারা জনসাধারণ বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করতেই পারে। ব্যক্তিগত কর্তব্য-সাধনে অপর ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষ কিছুটা হয়ই। সমষ্টি-ব্যাপারে তা আরও সম্ভব। কিন্তু এ কথা ভুললে

চলবে না যে, এ দ্বন্দ্ব ন্যায়াধিকার প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি বা দলের সৃষ্টি নয়। সত্য ও অহিংস উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে প্রতিপক্ষের অনুযোগ করার কিছু থাকে না। ইচ্ছে করলেই প্রতিপক্ষ এই অশান্তিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারেন।

বিপক্ষের অন্তর-শুদ্ধির উপাদান অপ্রতিরোধ-নীতির মধ্যে আছে। সত্যাগ্রহেও তা বিদ্যমান, তবে কিছু সূক্ষ্ম রূপে। ব্যক্তি-মনের তুলনায় সমষ্টি-মন অনুন্নত ও জড়তাপন্ন, যুক্তি ও নীতির প্রভাব এর ওপর কম। এ কারণে গর্ব, অহমিকা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলির দ্বারাই সমষ্টি-মন বেশী পরিচালিত হয়। সেজন্য, কল্পিত অর্থে ছাড়া সমষ্টি-মন ব'লে কোন জিনিস আছে কিনা সন্দেহ হয়। সে যাই হোক, এর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে। ব্যক্তি-মনের ওপর সত্যাগ্রহ যেমন কাজ করে, সমষ্টি-মনের ওপর তেমন পারে না। এর কারণ এই যে, সমষ্টি-মন অধিকতর জড় ও স্থূল ; তাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আবেদন এর মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। কিন্তু তা হ'লেও যথার্থ সত্যাগ্রহী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও সত্যাগ্রহের প্রভাব প্রত্যক্ষ

করেছেন। এর ফলে বিপক্ষদলে অত্যাচার ও বাহুবল আশ্রয় করার প্রবৃত্তি অনেকটা যে কমে তাও দেখা গিয়েছে। কারণ, উষ্মা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবার কোন হেতু এতে থাকে না। আঘাত ক'রেও বাধা না পেয়ে আঘাত করার শক্তি লোপ পেয়ে যায়। আবার নিরপেক্ষ দলের সহানুভূতি ধীরে ধীরে সত্যাগ্রহীর দিকেই ঝোঁকে। তা হ'লেই দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এর প্রভাব না থেকেই পারে না। এই প্রসঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, সমষ্টিগত সত্যাগ্রহ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মত তত অহিংস, শুদ্ধ এবং ঐকান্তিক হতে পারে না। আর এইজন্যই শোধন-সংস্কারের পথ অনেক-খানি ব্যাহত হয়।

সত্যাগ্রহ বিষয়ে যাঁরা কোন চিন্তা করেন নি একমাত্র তাঁরাই একে অবাস্তব কল্পনা ব'লে মনে করতে পারেন। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে সত্যাগ্রহের কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও এ কথা মানতে হবে যে, অনেকাংশে তা নোতুন রূপ নিয়েছে বর্তমানে। কিছু রূপান্তরিত হয়ে এই নীতি শিল্প ধর্মঘটে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ক্রমেই তা প্রসার লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও একথা

এখন স্বীকৃত হচ্ছে যে যুদ্ধ যদি বন্ধ করতে হয় তো তা অস্ত্রব্যবহারের দ্বারা হ'তে পারে না। এতে ক'রে কেবল অস্ত্র-উৎপাদনই বেড়ে চলে আর নব নব সংঘাত, বিদ্বেষ ও ভীতির সৃষ্টি হতে থাকে। এখন অনেক ছোট ছোট দেশ সত্য সত্যই যুদ্ধ করতে রাজী নয়। তথাপি সংঘর্ষ এড়াবার কোন উপায় সম্ভব হয় না ব'লেই তাদিকেও অস্ত্র ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ফাঁদে পড়তে হয় এদের, যদিও তারা নিশ্চয় বোঝে যে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা ও সম্পদশালী জাতিসমূহের শক্তিকে বাধা দেবার শক্তি তাদের নেই। এমনি ক'রে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের শেষ হয় না, একের পর এক চলতেই থাকে। কিন্তু এমনি ক'রে চলাই কি বিধেয় ? না যদি হয় তো উপায় ? মনে হয় সমষ্টিগত হিংসা-বিদ্বেষ-নীতি ত্যাগই এই উপায়। সমষ্টিগত জীবনে আজ বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের বাণীকে কাজে লাগাতে হবে। ঘৃণাকে জয় করতে হবে ঘৃণা দিয়ে নয়, প্রীতি দিয়ে ; হিংসাকে জয় করতে হবে হিংসা দিয়ে নয়, অহিংসা দিয়ে।

স্বীয় বিশ্বাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির রীতি অনুসারেই গান্ধীজি জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠার নূতন পদ্ধতি ও চিন্তাধারা আবিষ্কার করলেন। এই রীতির মর্ম এই যে ব্যক্তিগত আচরণে যে অহিংসা ও সত্যের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও তার ব্যবহার হতে হবে। এমন এক সময় ছিল যখন ব্যষ্টির দৈহিক শক্তিই ব্যক্তিগত সমস্যার মীমাংসা ক'রত। ব্যক্তি-জীবনের প্রতিশোধ ও প্রত্যাঘাতই ছিল তখন বিচারের উপায়। সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মাবতারগণ এই ব্যক্তিগত শক্তির অপপ্রয়োগকে চেয়েছিলেন নিয়ন্ত্রণ করতে। অবশ্য সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রত্যাঘাত রীতির পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এক সময়ে মানব-সমাজে এর প্রয়োজন ছিল বটে কিন্তু পরে ঐ রীতি সমাজোন্নতির বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। উন্নতিমুখী সমাজের জন্য দরকার হ'ল একটি নূতন নীতির। এই নূতন নীতি হ'ল সহযোগিতা ও অহিংসার নীতি। এখন কোন আহত ব্যক্তি ফিরে আঘাত করলে তাকেও বিপন্ন হ'তে হয়। অনধিকাল পূর্বে আহত

ব্যক্তি প্রত্যাঘাত করতে না চাইলে ভীরু ব'লে অভিহিত হ'ত। কিন্তু এখন তা করতে গেলে উপহসিত হ'তে হয়ই। ও-নীতি এখন বন্য ও অশিষ্ট ব'লে পরিচিত। ন্যায়ানুমোদিত বিবেচিত হলেও ও-নীতির প্রয়োগ এখন নিন্দিত ও দণ্ডিত হয়।

আজ সমষ্টিগত জীবনেও ঐ হিংসা ও সংগ্রামের নীতির প্রয়োজনীয়তা থাকাতেও এর অপূর্ণতা ও বাঞ্ছিত ফললাভের অসামর্থ্য সুবিদিত ও স্বীকৃত। প্রাচীন কালে যুদ্ধের যে মহত্ত্ব ও মহিমা থেকে থাক্-না-কেন, বর্তমানে এর মধ্যে পাশবিকতা ও নীচতা ছাড়া আর কোন কিছু পাওয়া যায় না। সমষ্টিকে সভ্য ও উন্নত করার শক্তি আর এর নেই। তাকে সে অবনতই করে; আর সমষ্টি-জীবনের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির ওপরই গিয়ে পড়ে। তা হ'লেই বলতে পারা যায় যে, সমষ্টি-জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

ঐ সমস্যা-সমাধান বলশেভিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদেরও লক্ষ্য; কিন্তু যে কূটনীতি, বিদ্বেষ, অত্যাচার ও যুদ্ধ প্রভৃতি অপসারণীয়, উক্ত তন্ত্রে সে সমস্ত উপকরণ-রূপে গৃহীত হয়েছে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ওপরেই সাম্যবাদীদের নির্ভর।

শ্রেণীবৈষম্য দূর না ক'রে তাকে বাড়িয়ে তোলাই সাম্যবাদীদের কাজ। তাঁদের যুক্তি এই যে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীসংঘাতের অস্তিত্ব কোন বাস্তববাদীই অস্বীকার করতে পারবেন না। সত্যাগ্রহও বাস্তবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত; শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সংঘাত একেও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই সংঘর্ষকে কমিয়ে, চাই কি, সরিয়ে দিয়ে সত্যাগ্রহ চায় সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে। ব্যক্তিজীবনেও দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকে, কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিক ও সমাজ-সংস্কারকগণ তাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্যের বন্ধন স্থাপন করেন। মানুষের মধ্যেকার আপাত-বৈষম্যের আড়ালে যে ঐক্য আছে তাকেই তাঁরা দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করেন। এই ঐক্যবোধই তাঁদের সকল শিক্ষা ও কর্মকে করে অনুপ্রাণিত। সত্যাগ্রহের ব্রতও অনুরূপ। যেখানে সত্যাগ্রহ এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয় না সেখানে এ সমষ্টিগত সংঘাতকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস করবার চেষ্টা করে। সম্ভবমত সত্যাগ্রহ মনের নীচে বৃত্তিগুলির লোপ করবার চেষ্টা করে। কোন ঈর্ষান্বিত মিথ্যা প্রচার এর নীতি ব'লে গৃহীত হয় না; এতে শত্রুর প্রতিও থাকে না

কোন আক্রোশ। বিরোধীর মধ্যেও সত্যাগ্রহী মানুষের ঐক্যকে উপলব্ধি করে। অত্যাচার ক'রে অত্যাচারীও যে অজ্ঞাতসারে অধঃপতিত হয় অথচ সে বিষয়ে সে অজ্ঞতার জন্যই উল্লসিত হয়—মানুষের এই অবস্থা সত্যাগ্রহীকে ব্যথিত করে। তিনি জানেন যে, এই অজ্ঞতা অপসারিত হ'লেই তার অত্যাচার প্রবৃত্তি আর থাকবে না; তাই তিনি তার প্রতি ক্রোধ পোষণ না ক'রে তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে চান। সেইজন্যই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় তাঁর সংগ্রাম, বিরোধ তাঁর যত বিশেষ কোন অবস্থা বা ক্রিয়ার সঙ্গে। এও তিনি জানেন যে, এই অবস্থার জন্যে শুধু ব্যক্তিই দায়ী নয়, অতীতের পুঞ্জিত কর্ম ও অজ্ঞতা এর উদ্ভব ঘটিয়েছে; ইচ্ছে করলেই মানুষ এই যুগ-সঞ্চিত সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না।

কিন্তু সাম্যবাদ সত্যাগ্রহ-নীতিকে গ্রহণ করেনি; এর কথা অন্য। এই মতবাদ মানুষের মধ্যেকার পার্থক্য ও বৈষম্যকেই বড় ক'রে দেখে, তার মৌলিক ঐক্য তেমন উপলব্ধি করে না। সাম্যবাদের বিদ্বেষ ও আক্রোশের নীতি প্রত্যেক দেশেই বিবদমান দলের সৃষ্টি করেছে।

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে অস্বীকার করবার

উপায় নেই ; শুধু অর্থ নৈতিক কারণই এর মূলে, এ কথা বলা ঠিক নয়। এই বিরোধকে উপেক্ষা না ক'রে তাদের মূল নিরাকরণ ক'রে মীমাংসা করা চাই। এখানে হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন যিনি তাঁকে আমরা দেশপ্রেম কি মানব-হিতৈষণার গৌরব দিতে পারি কি ক'রে? যাঁরা মনে করেন গায়ের জোরেই এই পার্থক্য ও মত-বৈষম্যকে মিটিয়ে নেওয়া যায় তাদিকে উন্মাদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, এ রকম জাতীয় শত্রুও আমাদের মধ্যে আছে।

সাম্যতন্ত্রে অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচারিতের আক্রোশ উস্কিয়ে দেওয়া হ'য়ে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, অন্যায় ও অবিচারের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে তাদের প্রতিকার-ব্যবস্থার জন্য। সত্যদ্রষ্টা নীতি-সংস্কারকও অত্যাচারিতের বিচার-শক্তি উদ্দীপ্ত ক'রে ন্যায়-ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু উপায় তাঁর ভিন্ন; শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রীই তাঁর উপকরণ।

বলশেভিক নীতি অর্থ নৈতিক সমস্যার যে সমাধানই করুক না কেন, শান্তি-প্রতিষ্ঠার সমস্যা ঠিক যেখানকার

সেইখানেই রয়ে গিয়েছে, হয় তো বা কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক সমরের ওপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব অশান্তি আরও বাড়িয়েছে এই সাম্যবাদ। রাশিয়াতেই কি ঘটেছে? বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধ্বংস ক'রেই এ বিপ্লব ক্ষান্ত হ'তে পারেনি; এই নীতি ও মতের যাঁরা জনক ও স্রষ্টা তাঁদিকেও এর করালগ্রাসে কবলিত হতে হচ্ছে। বুর্জোয়ারাও স্ট্যালিনের রোষে না পড়তেও পারে কিন্তু কমিউনিষ্ট ও মার্কস্‌-পন্থীদের তার উপায় নেই। বলশেভিক রাশিয়া এখন সাম্রাজ্যবাদী ও পরস্বাপহারী জাতিগুলির সঙ্গে মৈত্রী করেছে; কিন্তু দেশের মধ্যে সে এখন কোন মতান্তর সহ্য করতে চায় না। এ অবস্থা মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টধর্মের গোঁড়ামির মতই। যে কেউ ধর্ম-শাস্ত্রের চিরাচরিত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা ক'রত সে ত ধর্মত্যাগী নাস্তিক নাম পেত আর গুরুতর শাস্তিও পেতে হত তাকে। আধুনিক বলশেভিক নীতিতেও অনেকটা দাঁড়িয়েছে সেই রকম।

ইদানীং রাশিয়ার কূটনীতি, অপরাপর ধনতান্ত্রিক দেশের কূটনীতির চেয়েও বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য। চতুরতা, গোপনীয়তা ও সুবিধাবাদই হয়েছে এখন নীতির মূল

কথা। একদিন তস্কর-সংঘের সঙ্গে ছিল এর সংঘাত কিন্তু আজ তাদের সঙ্গেই এর গলাগলি। একদিন এর নীতি ছিল যে, সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই আসবে সর্বহারাদের সুযোগ ; কিন্তু এখন রাশিয়া শান্তিতে বিশ্বাস করে। যে এর সঙ্গে মত মেলাতে পারলে না সে হ'ল দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ! ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত আজ রাশিয়াও বিশ্বাস করে যে, যুদ্ধ দিয়েই যুদ্ধ শেষ করতে হবে ! আমাদের মতে, কি আভ্যন্তরিক কি আন্তর্জাতিক কোন শান্তিই ঐ উপায়ে পাওয়া যেতে পারে না, আর এই শান্তি না হ'লে মানব-সমাজের আর কোন উন্নতি বা বিকাশের আশা নেই, চাই কি, এর জন্যে মানুষ এতকাল ধ'রে বহু শ্রমসাধনায় যা কিছু লাভ করেছে তা যাবে লোপ পেয়ে।

বলশেভিজ্‌মের ধারণা, শ্রেণী-সংঘাতের দ্বারাই আন্তর্জাতিক সমরের শান্তি ও বিরতি ঘটবে। বিপ্লবের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন এর অন্যতম নীতি। সাফল্যই এর একমাত্র লক্ষ্য ; সবকিছুই এর মাপে বিচার করা হবে। স্ট্যালিন সেদিক থেকে সফল হয়েছেন, কিন্তু ট্রট্‌স্‌কি ও তাঁর সমর্থকেরা হয়েছেন ব্যর্থকাম। সাফল্যই

সেখানে সচ্চরিত্রতার মাপকাঠি। এর জন্যে ধনতন্ত্রবাদ যে যে উপায় গ্রহণ করে, বলশেভিজ্‌ম্‌ও ঠিক তাই করেছে। প্রায় সবদিকেই এ প্রাচীন পদ্ধতিগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আবরণ-আচ্ছাদন দিয়ে গ্রহণ করেছে। এর সামরিক যন্ত্রপাতি আরও সুগঠিত ও নিপুণ। এর প্রচার-যন্ত্র ধনিক বা ফ্যাসিস্ট দেশের প্রচার-যন্ত্রের চেয়ে সূক্ষ্ম ও নিপুণতর। ধনিক দেশে যুদ্ধের জন্য যেমন ব্যক্তিকে কাজে লাগান হয় রাশিয়ায় সমষ্টিগত ও স্বার্থের জন্য তেমনি তাকে বলি দেওয়া হয়। সেখানে বলশেভিজ্‌ম্‌কে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পেয়ে থাকে। অস্ত্রবলে সেখানে একটি দলেরই প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা চলে; সে দলকে বলা হয় চাষীমজুরের একনায়কী শাসনতন্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলশেভিক দলের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা, চাষী-মজুরদের হাতে নয়। এই দল ফ্যাসিস্ট দলের মতই সুনিয়ন্ত্রিত।

গান্ধীজি এই সমস্ত রীতির বিপক্ষে। এই যুদ্ধে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয় সেসব ব্যবহার না ক'রে অহিংস ও শান্ত ভাবে তিনি যুদ্ধ-স্পৃহা অপসারিত করতে চান। লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে তিনি যে-কোন উপায় ও অজুহাত অবলম্বন করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে লক্ষ্য যতই লোভনীয় বা কামনীয় হোক না কেন, উপায় সৎ ও শুদ্ধ হওয়া চাই, কারণ, তার কাছে উপায় ও লক্ষ্য তুল্যমূল্য। ইটালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ধনিক দেশগুলি ইটালীর যে বিপক্ষতা করেছিল রাশিয়া তার চেয়ে কিছু বেশী করেনি; আর এই বিপক্ষতা প্রত্যাহার ব্যাপারে তার আগ্রহ দেখা গিয়েছিল ঐ দেশগুলির মতই। কিছুকালের জন্যে সে ইটালীকে প্রয়োজনমত তেল ও পেট্রোল দিয়ে সাহায্য করেছে; এর কারণ তার বহির্বাণিজ্য বাড়ান। গান্ধীজি-অধিনীত ভারত কোন শোষক জাতিকে সমরোপকরণ দিয়ে সাহায্য করবে এমন কথা ভাবাই যায় না। এই উপায়ে লাভ-প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করতেই শিক্ষা দেবেন তিনি। তাই অনেকে বিস্মিত হন যে, তিনি মাদকদ্রব্য থেকে পাওয়া

মোটা রকম একটা আয়কে কৃষক ও জনসাধারণের কাজে না লাগিয়ে সেটাকে তুলে দিতে চান। লোকসাধারণ, বিশেষত গরিবদের নৈতিক ও মানসিক অবনতি ঘটিয়ে যে কলুষিত অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে সমাজ পরিগঠনের কাজ করার চেয়ে কোন সংস্কার না করাই বরণীয় মনে করবেন তিনি। কারণ তিনি জানেন যে, অপরাপর বিষয়ে সংস্কারের বিলম্ব হ'লেও ও বিষয়ে তা হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে অন্যায় ও কূটনৈতিক উপায়ে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হওয়া উচিত নয়, তা সে যত বড়ই হোক না কেন। এ ব্যাপারে তিনি যে শুধু নীতির দিক থেকেই দেখেছেন তা নয়, অর্থনীতির দিক থেকেও দেখেছেন; সেটা হচ্ছে এই যে, মাদক-ব্যবহারী লোকদের কাছ হ'তে গভর্নমেণ্টের শতকরা ১০ হতে ১৫ ভাগ আয় হয়ে থাকে, কিন্তু এই দ্রব্য বর্জন করলে তারা যে টাকাটা সঞ্চয় করতে পারে সেটা তার চেয়ে অনেক বেশী। অবিশ্যি এই সঞ্চয়ের আশা না থাকলেও গান্ধীজি এ বিষয়ে ঠিক একই মত পোষণ করতেন, কোন প্রলোভন বা লাভেচ্ছা তাঁকে এ মত থেকে নিবৃত্ত করতে পারত না।

তা হলেই দেখা যায়, গান্ধীজির নীতি বলশেভিক

নীতির চেয়ে শক্ত ও নিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলেও পৃথিবীর শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা-ব্যাপারে তাঁর ব্যবস্থাই সুসাধিত ও বরণীয় ব'লেই মনে হয়। তাঁর নীতি দিয়ে সমষ্টি-জীবনকে নীতি-নিয়ন্ত্রিত ও সভ্য করা এবং সমর ও ধ্বংস বাদ দেওয়া এই দুটো সমস্যার সমাধান হবে কিনা এখনো অবধি নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে, আজ পর্যন্ত যেসব উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হয়েছে সেগুলির মধ্যে এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ। মানব-সমাজের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশও ঐ নীতিকে সমর্থন করে। কিন্তু মানব-সমাজ যদি গ্রহণ-সমর্থ না হয়, তা হলে সৎনীতি ও সত্য প্রচেষ্টাও লক্ষ্যলাভে ব্যর্থ হয়; সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি অনুকূল অবস্থার ওপরে। এর মধ্যে অদৃষ্টের ব্যাপারও কিছুটা ধরে রাখতে হবে। আগেকার মহামানবেরা, গান্ধীজির চেয়েও যাঁরা ছিলেন বড়—তাঁরা যে-হিসেবে বিফল হয়েছেন গান্ধীজিও সে হিসেবে বিফল হ'তে পারেন; কিন্তু এ কথা ধ্রুব যে বহু-অধ্যবসায়-সাধন-লব্ধ যে সত্য, মানুষের ক্রমোন্নতির পক্ষে যা একান্ত অপরিহার্য, মানব-সমাজকে তা গ্রহণ করতেই হবে, অনেক ব্যর্থতার পরে হ'লেও

মোট কথা তা করতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত যে উন্নতি করেছে তাকে যদি রক্ষা করতে হয় এবং বাড়াতে হয়, তা হ'লে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে, সমষ্টি-জীবনের নীতিবোধ ও দ্বন্দ্বের সমাধানকল্পে গান্ধীজির সত্য ও শান্তির নীতিকে গ্রহণ করতে হবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, শ্রেণীসংঘাত ও সুবিধাবাদ যে ঐসব সমাধান করতে সমর্থ হবে, এমন আশা মরীচিকার অনুসরণ ব'লেই মনে হয়।

———

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী
উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

৬৮১ পৃষ্ঠায় বাঙলা ভাষায় ঘটনাপঞ্জী বহুল একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী। ডিমাই সাইজ। দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম ষোল টাকা।

নোয়াখালিতে মহাত্মা—সুকুমার রায়	৮·০০
গান্ধী ও মার্কস—মশরুওয়ালা	৫·০০
বাদশা খান্—ঋষি দাস	৬·০০
গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস	৮·০০
সংক্ষিপ্ত আত্মকথা—মহাত্মা গান্ধী	৩·০০
গান্ধীজী—অনাথনাথ বসু	২·৫০
সীমান্ত গান্ধী—সুকুমার রায়	৩·০০
মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ	৩·০০
অহিংস বিপ্লব—জে. বি. কৃপলানী	২·০০

শিক্ষা

সংকলক। শ্রী শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহান শিক্ষাবিদ মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা ও বাণীর ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংকলন। ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী শিক্ষাবিদ আচার্য শ্রী বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। দাম পনেরো টাকা মাত্র।

• ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি •
কলিকাতা-১২